দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2-3 NOV 1997...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

অভিমত

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বিড়ম্বনা আর কতদিন?

এফ এম আবদুর রব

মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি বিশেষ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ চালু করার ফলে শব্দহীন, ভাষাহীন উত্তর দিতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা যে নানা রূপ ধাঁধার সম্মুখীন হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় চার-পাঁচ বছর পূর্বে অনেকেই পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। আমিও এ বিষয়ে দু'একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, যা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তার কিছুই হয়নি। বর্তমান সরকারের নীতি নির্ধারণে কিছুটা আশাবাদী হয়ে আবার লিখতে হলো প্রায় একই কথা। পরীক্ষা সংস্কারের নামে এত টাকাপয়সা খরচ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ বিড়ম্বনার অবতারণা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রায় অর্ধেক অংশ টিকচিহ্ন বা ক্ষুদ্র গোলক ভরাটসূচক উত্তরের আওতাভুক্ত করাতে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের যে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পরীক্ষাতক্তে দিন কাটাতে হচ্ছে, তা থেকে তারা কোনদিন পরিত্রাণ পাবে কি? কম্পিউটার দিয়ে যদি সবই চলে তবে পরীক্ষার বাকি অর্ধেক লেখাজোখার উত্তরগুলোও এর সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিলেই তো পরীক্ষক বলে অহেতুক কোন 'সমস্যাই' থাকে না। পরীক্ষকদের প্রত্যাশিত যোগ্যতায় আমরা যখন এতই সন্দিহান এবং এ নিয়ে করণীয় কিছুই নেই, তখন তাদের অস্তিত্বই বা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? শিক্ষাজগতে প্রায় পঁচিশ বছর পিছিয়ে যান্ত্রিক জগতে পঁচিশ বছর এগিয়ে গতানুগতিকতা ও যান্ত্রিকতার টানাপোড়েনে আজ আমরা যেন একই স্থানে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি। এ আবর্তনের মধ্যে আমাদের বিবর্তনের পথ কোথায়?

১৯৯০ সালে গোটা মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রায় অর্ধেক ভাগের প্রশ্নোত্তর টিকচিহ্নসূচক বহুমুখী নির্বাচনধর্মী নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার (multiple choice type) আওতাভুক্ত করা হয়, যদিও পরীক্ষা জগতে বিচিত্র ধরনের অভীক্ষাপদ বিদ্যমান, যেমন সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূর্ণকরণ (completion type), পুনরুদ্রেক (recall type), সংক্ষিপ্ত উত্তর সংবলিত (short-answer type), সত্য-মিথ্যা নিরূপণ (ture-false type) এবং যোজ্যতা নির্ণায়ক (matching type)। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসব বিচিত্র ধরনের প্রশ্নপদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক মিটিয়ে থাকেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার নামে এসব বিভিন্ন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদের বিলোপ সাধন করে একতরফাভাবে জটিলতর বহুমুখী নির্বাচনধর্মী পদ্ধতির চূড়ান্ত নির্বাচনকে কোন্ অর্থে নৈর্ব্যক্তিক বলা যায়, তা আজও স্পষ্ট নয়। কোন ভাষার ব্যবহারিক ব্যাকরণের উত্তর মূলত ও সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক। পূর্বে সকল পরীক্ষাতেই ব্যাকরণের প্রশ্নপদ নৈর্ব্যক্তিকই ছিল। এমতাবস্থায়, হঠাৎ করে ভাষা শেখার গুরুত্বপূর্ণ দিক তথা লিখিত অনুশীলনের সুযোগটুকু পরিহার করে ঢালাওভাবে এতো আয়োজনের ব্যবস্থা করা হলো কোন্ বৃহত্তর স্বার্থে? অন্যান্য বিষয় যেমন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজপাঠ ইত্যাদিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু কোন্ পদের সীমা কতটুকু ও কিভাবে তা প্রণয়ন করতে হয়, তা না জানলে পরীক্ষার যথার্থতা (validity), নির্ভরযোগ্যতা (reliability) এবং নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের উপর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রয়োগ ও তার ফলাফল জরিপ করে আমরা তা কার্যকর করতে পারি কি? বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে আমরা কে কত আগে ও কিভাবে কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ মেনে নিয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্থাপন করতে পারি, সেটাই যেন বড় পরীক্ষা। তাই, ছোটদের পরীক্ষার এরূপ দুরবস্থা এবং জবাবদিহিতার এতো অভাব।

বহুমুখী নির্বাচনধর্মী অভীক্ষাপদ তৈরি করতে একজন শিক্ষককে কয়েকটি নীতিমালা মেনে নিতে হয়। তা না হলে অভীক্ষাপদ গঠনে ভুলভ্রান্তি যেমন অবধারিত, তেমনি শিক্ষকের পরিমাপ ক্ষমতার (measuring efficiency) বিকাশ অনিশ্চিত। পরিমিত ব্যয় (Moderate cost) অভীক্ষাপদ গঠনে স্পষ্টতা (clearity)-এর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নির্ণয় (internal consistency of items), সহজ পরিচালন ব্যবস্থা (ease of administration), অভীক্ষাপদের কাঠিন্যমান (difficulty value) এবং বিশেষ করে পার্থক্য নির্ণায়কমান (discriminating value) তথা প্রত্যেকটি অভীক্ষাপদ কি পরিমাণে বা কতটুকু সার্থকতার সঙ্গে উচ্চ ও নিম্নমানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং বিচলকগুলো (distractors) সংগঠনের দিক দিয়ে কতটুকু কার্যকরী তা বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন হলো, এক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের প্রতি পত্রে এত ব্যাপকভাবে ৫০টি অভীক্ষাপদ তৈরি করে ১৫০টি বিচলক আবিষ্কার করতে স্কুলে প্রতি বিষয়ে কতজন বিশেষজ্ঞ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, যারা এ কাজে অভ্যস্ত? এ নিয়ে একজন শিক্ষককে যে কত হিমশিম খেতে হচ্ছে এবং উক্ত কাজে কত শ্রম, সময় ও কাগজ খরচ হচ্ছে তা একমাত্র শিক্ষকরাই বুঝতে পারেন। প্রয়োজনের বাইরে এমন অনুৎপদী কাজে সময় ব্যয় করে কতজন শিক্ষক বিকাশধর্মী বা শিক্ষামূলক কাজ যেমন, পাঠ-প্রস্তুতি, প্রেষণা, পরামর্শ, নির্দেশনা এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে সক্ষম? এরূপ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একচেটিয়া আধিপত্যের সুবাদে বাজারে বড় বড় আকারের যেসব নৈর্ব্যক্তিক গাইড বের হচ্ছে, সেগুলোর উপর ছেলেমেয়েরা এমন কি অনেক শিক্ষকও নির্ভরশীল। এসব গাইডে সঠিক উত্তরের সাথে তিনগুণ বিকল্পগুচ্ছ বা ভুল উত্তর দেয়া থাকে। এখানে বলতে হয়, ভুলেরও একটা সীমা আছে। ছেলেমেয়েরা এসবের মাঝে নিমগ্ন থেকে যে সময় ব্যয় করে তারও একটা সীমা থাকা দরকার।

এখানে উল্লেখ্য, এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের চাইতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অধিকতর ফলপ্রসূ। কারণ বয়স্করা ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে অনেকটা পরিপক্বতা নিয়ে সঠিক উত্তর বাছাই করতে ততটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না। কোন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আহরিত জ্ঞান ও পারদর্শিতা পরিমাপের জন্য বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিক মূল্যায়নই যথেষ্ট কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতিটি পত্রকে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক এই দুই খণ্ডে পৃথক করে প্রতি খণ্ডে পাসের হার নির্ধারণ করে যে জটিলতার সৃষ্টি করা হলো, তার মাঝে কি মঙ্গল নিহিত আছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে, ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় (learning process) দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বাধ্যবাধকতা, বিভ্রান্তি, বৈচিত্রহীনতা, অনুমান প্রবণতা ও অবসাদ অনুপ্রবেশ করে তাদের আগ্রহ উদ্যোগকে কিভাবে ব্যাহত করছে, তা ১৯৯৪ সাল হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় থেকে বোঝা যায়। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দুটি পরীক্ষার মধ্যে পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা ও সহগতি (corelation) বিদ্যমান থাকলে মাত্র দু'টি শিক্ষা বছরের ব্যবধানে ছেলেমেয়েদের মাঝে উত্থান-পতনের এত বড় ধস নেমে আসতে পারে না। বলাবাহুল্য, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রয়োজন আছে কিন্তু কর্তৃত্বের নামে আমরা শিশুদের উপর যেভাবে প্রভুত্ব শুরু করে চলেছি, তাতে শিশুরা আমাদের প্রতি কতটুকু আস্থাশীল? ছেলেমেয়েরা আমাদের প্রতি, সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে বলেই প্রথমে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ইদানীং পরীক্ষার তারিখ এমন কি সময়সূচি নিয়েও রাস্তায় বিক্ষোভ, মিছিল ও গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সবকিছুই কি আমাদের ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ নয়? ক্ষমতার দুর্নীতি অন্যান্য স্থানের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও মারাত্মক। শিশুরা আজ এ দুর্নীতির শিকার।

বছরখানেক আগে শুনেছিলাম, বর্তমান সরকার বিষয়গুলো তলিয়ে দেখছেন। এতে বড়ই আশার সঞ্চার হয়েছিল; কিন্তু তা দেখতে দেখতে কতদিন সময় লাগবে, সেটাই প্রশ্ন। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলা দরকার, গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের পাশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে যে শোরগোল পড়ে যায়, তা দেখে অবাক লাগে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান সন্তানের জন্যই পরীক্ষা নয়। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা, উন্নত সামাজিক পরিবেশ, বাঁধাধরা নামে জানা বিদ্যালয়ের পরশ, বহুবিধ কোচিং এসব সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে যে কয়েকজন কৃতী সন্তান মেধা তালিকায় দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়, তারা জাতির গর্ব বটে; কিন্তু শত বঞ্চনার কষাঘাতে এ দেশের গ্রামীণ জনপদের অসংখ্য শিশু-কিশোর যেখানে মেধা বিকাশের সুযোগ হতে বঞ্চিত, সেখানে মেধার দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা ও হাঁকাহাঁকি করা কি বাড়াবাড়ি নয়? আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতে আমরা শিশুদের চর্চা করি না, শুধু পরীক্ষা চর্চা করি বলেই আজ জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার অভাব না থাকলেও মানুষের বড় অভাব। শিশুদের স্বাস্থ্যময় বিকাশ ছাড়া শুধু মেধা নিয়ে মানুষের চাইতে ব্যক্তিগত মানুষই তৈরি হয় বেশি।

আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। পরীক্ষা পরীক্ষা করে তারা পীড়িত ও পরিশ্রান্ত। পরীক্ষার সাফল্যই যেন তাদের জীবনের সাফল্য; কিন্তু পরীক্ষা আর জীবন এক কথা নয়। পরীক্ষার ধারণা (concept) এমন গতানুগতিক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে, প্রকৃতপক্ষে তা শিশুদের স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করছে, জ্ঞান চর্চাকে ব্যাহত করছে, আগ্রহ-উদ্যোগকে বিকৃত করছে ও আত্মশৃঙ্খলাকে বিভ্রান্ত করছে। নোট মুখস্থ করে কিভাবে পরীক্ষায় পাস করা যায়, শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়েও অভিভাবকদের ধোঁকা দিয়ে কিভাবে একের পর এক সিঁড়ি ডিঙানো যায় তাই তারা শিখে। এ অবস্থায় শিশুদের সংযত ও সংহত করার নামে আমরা পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাকে জটিলতর করে ফেলেছি। পরীক্ষা ব্যবস্থা আজ জরাগ্রস্ত, শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ব্যাধিগ্রস্ত। ছেলেমেয়েদের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমের মান প্রতিষ্ঠাকল্পে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের প্রয়োগসহ পরীক্ষাকে কিভাবে সুস্থ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত করা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেদিকে অতি জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে এ পদক্ষেপ একান্তভাবে প্রত্যাশিত। আর বিলম্ব নয়। নতুন যুগে অতীতের মানুষ তৈরি করে আমরা ভবিষ্যতের কাজ করি বলে আমাদের কোন পরিবর্তন নেই। পরিশেষে আমি চিন্তাবিদ ইমারসনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ঃ

The true test of a civilization, is not the census, nor the size of the cities, nor the crops, but the kind of man the country turns out.